OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 224 - 232
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রসঙ্গ কালের বিবর্তনে দরিদ্র জীবন সংগ্রাম : সুশীল জানা ও ভগীরথ মিশ্র

বৈশালী সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর
Email ID : baishalisarkar158@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Sushil Ranjan Jana, Bhagirath Mishra, short story, insulted people, will to live, their words in short stories.

Abstract
After the advent of Bengali fictional short stories, a significant shift in their central themes was taken place after the First World War. Moving beyond personal narratives, these stories began to reveal societal truths such as class-divided structures, class struggles, and the exploitation by rulers through the authors' writings. The struggles for survival faced by the poor and lower-class people, along with their deprivation, humiliation, and intense suffering, are vividly portrayed in the works of Sushil Jana, a contemporary writer of the time of the World War. However, the story of this lament does not stop even after the independence of India. Writer Bhagirath Mishra depicted a similar picture through his literary works. Although there is a gap of almost thirty years in the writings of the two writers, there is no particular difference in the life journey of the oppressed people portrayed in their stories. An attempt has been made to discuss these issues in this article.

Discussion

ভূমিকা : প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প - উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় এই তিনটি সাহিত্য রূপের জন্ম। এই তিনধারার মধ্যে ছোটগল্প পাঠক সমাজের কাছে বেশি প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটপ্রাণ-ছোটকথা-ছোটব্যাথা এবং শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার অনুভূতিই পাঠককে ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষিত করে তুলেছে। ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন পরিবেশ, সমাজ, শিক্ষা, সাধারণ মানুষ, অর্থ ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া যে কোনো বিষয়কে তার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা দিয়ে তুলে ধরেন পাঠকের কাছে। তার কাহিনী বর্ননার সহজ আঙ্গিক ও সত্যতা পাঠকের কাছে তার বার্তাকে পৌঁছে দেয় খুব সহজ ভাবে। ঊনবিংশ ও বিংশ এই দুই শতাব্দীতেই ছোটগল্প চর্চার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তবে দুই শতকের ছোটগল্পের বিষয়ে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে যেখানে নিটোল, খাঁচে বাঁধা, কাহিনি নির্ভর, একমুখী গল্প পাওয়া যায়, বিশ শতকে সেখানে গল্পের আঁটোসাঁটো ভাব ছেড়ে মনস্তাত্ত্বিক তীক্ষ্ণ নির্মাণ, সংকেতময় রচনা, সমাজের বাস্তব রূপকে লেখকেরা তাদের কলমে তুলে ধরলেন। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই ছোটগল্পের স্রোতবদল ঘটেছে। রক্ত মাংসে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তৈরি মানুষের সমাজ, বেঁচে থাকার লড়াই, বাস্তবের পটভূমি নিয়েই গল্পকারগণ গল্প রচনা করতে থাকেন। যা মানবহৃদয়, মানসিকতা ও মানবজগৎ-র সত্য চিত্র পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত করে ফুটিয়ে তোলে।

সুশীল জানা : লেখক সুশীলরঞ্জন জানার জন্ম ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন। মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন তিনি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে তিনি লেখা শুরু করেছেন। তাঁর প্রথম গল্প 'শেষ রজনী' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় 'উত্তরা' পত্রিকায়। এছাড়া তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবাসী', 'প্রবর্তক', 'অলকা' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রথম পর্বের তাঁর লেখায় যৌথ পরিবারের কাহিনী বর্নিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিম্নবৃত্ত, পিছিয়ে পরা সাধারণ মানুষ ও কৃষিজীবি মানুষদের কথা তাঁর কলমে তুলে ধরেছেন। দরিদ্রের জীবন সংগ্রাম, খাদ্য সংকট, নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্ত সমস্যা ইত্যাদি তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং তাই তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে।

এমনি অত্যাচারিত, শোষিত মানুষদের নিয়ে তাঁর ১৯৪৪ সালে রচিত 'রাত্রির লেখা' গল্পটি। গল্পের শুরুতেই এই চাষা মানুষগুলোর বিদ্রোহীসত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায় –

> "বিরাট একটা ধানের স্তুপ পুড়ে খাক্ হয়ে যায়,..."[১]

এবং সেই কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে হাসে কালো নোংরা দাঁতওয়ালা মানুষগুলো। গ্রামের চারিদিক জ্বলছে, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এমন দুঃসময়ে গল্পের নায়ক নবীন নিয়ে আসে পুলিস আর ফৌজ আসবার খবর। নবীনের ঘরে তার স্ত্রী তারিণীরও বাস। পুলিস এসে কেবল পুরুষদের ধরে নিয়ে বা মেরে দিয়ে যায় না, তাদের ঘরের স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। নবীনের সেই নিয়েই দুশ্চিন্তা, সে তারিনীকে বাপের বাড়ি রেখে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারিনীর যেন কোনো ভয় নেই, সে নিশ্চিন্তে আছে তার স্বামী সঙ্গে আছে বলে। তারিণীর কথায় –

> "স্বোয়ামী যার পাঁচ জনকে ভরসা দেয় -তার আবার ভয় কি!"[২]

তারিণীর রাত ভর বাচ্চাদের হাত ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে পালাতে ভালো লাগে না আর। পুলিস আসার খবরে পাশের চার পাঁচটি গ্রামের মানুষ ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়িয়ে পরে পথে, পুলিস থেকে লুকোতে। নবীন তারিণীকে তাড়া দেয় সব গুছিয়ে নেওয়ার। কিন্তু তারিণীর কণ্ঠে শোনা যায় তীব্র প্রতিবাদ –

> "কিসের জন্যে এই কুকুর-বেড়ালের মতো ঘোরা বাপু?"[৩]

তারিণী কেঁদে ফেলে। গত একমাসের মধ্যে নবীন কত শাঁখের ডাক, কত সভা সমিতি, কত বন্দুকের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে পরেছে। এই শোষনের বিরুদ্ধে লড়াই-এ প্রতিবেশী সাবিত্রির স্বামী মারা গেছে, গোকুল নিখোঁজ হয়েছে, তার ওপর নবীন ভীষন গোঁয়ার, তাই তাকে নিয়ে তারিণীর বড়ো ভয়। সে কথা চায় নবীনের কাছ থেকে, সে যেন মারামারি না করে এবং প্রাণে না মরে। এই অংশে এই তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষ যারা অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে পরেছে, তাদের মধ্যেও ভালোবাসার স্বরূপ লেখক তুলে ধরেছেন –

> "একটা রোগা কালো মেয়ের সভয় কণ্ঠস্বর আর ভীরু সশঙ্কিত দৃষ্টি যে এত ভালো লাগে-আর তাকে বেষ্টন করে বলতে ইচ্ছে করে নাঃ না- সে মারামারি করবে না।"[৪]

কথা দেওয়ার পর তারিণিকে বাপেরবাড়িতে পৌঁছে দেয়। সেখানে তারিণীর ফিরে না যাওয়ার আকুতিতে নবীন জানায়, পুলিস এসে প্রথমে খোঁজ করবে বড়লোক অবিনাশবাবুর বাড়ি। অবিনাশবাবু ও অন্যান্য বড়বাবুরা বার বার নবীনের কাছে সাহায্য চেয়েছে তাকে রক্ষা করার। আজ এমন বিপদের দিনে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চুপ করে লুকিয়ে বসে থাকবে কি করে নবীন। অন্ধকারে মিশে যায় নবীন, আর তারিণীর মনে ভাসতে থাকে –

> "মাথাটা থেঁৎলে গিয়েছে হয়ত লাঠির ঘায়ে অথবা সাবিত্রীর স্বামীর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জলার ধারে।"[৫]

ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে আসে তার। বড়দাদা অধরের কাছে কান্না কাটি করে তারিণী অধর ও আরো চার পাঁচজন বেরিয়ে পরে নবীনের গ্রামের উদ্দেশ্যে।

নবীনের গ্রামের সামনে গাঁয়ের জোয়ানেরা পাহাড়া দেয় শাঁখ হাতে, কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই তারা শাঁখ বাজায়। নবীনও আছে তাদের মধ্যে, হঠাৎ চোখে হালকা দেখা যায় একটি ছায়া মূর্তি, কিন্তু সে গ্রামের অন্ধ রামদাস

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈরাগী। তার যাবার আর গতি নেয়, তাই সে বেরিয়ে পরেছে একলা ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে। বৈরাগীর সঙ্গে কথোপকথনের পরই তাদের কানে ভেসে আসে দূরের গগন ভেদী আর্তনাদ। তারা জমাট বাঁধা অন্ধকারে খুঁজতে থাকে তার স্রোত। তারপরই দেখা যায় কয়েকটি ছায়া মূর্তি ছুটে আসছে তাদের গ্রামের দিকে, তারা শাঁখ বাজাতে থাকে উদ্ধশ্বাসে। যারা ছুটে আসছিল তারা জড় হয় নবীনের বাড়ির দেওয়ায়। নবীন কঠিন অন্ধকারে শুনতে পায় তার নামের ডাক –

"কে ডাকে তার নাম ধরে! তারিণীর দাদা অধরের গলা না?"[৬]

– নবীন আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে। অধর নবীনকে জানায় তারিণীর অনেক অনুরোধের পর যখন তারা গ্রামের পথ দিয়ে ফিরছিল হঠাৎ তাদের সামনে পরে যায় পুলিস –

"শাল ভল্টু হ্যায়-পাকড়ো..."[৭]

তারা সবাই ছিটকে পরে একে অপরের থেকে। নবীন সজাগ হয়ে ওঠে, অন্ধকারে ধাবমান চিৎকার শুনতে পায় – "আরে পিয়ারে"[৮] তারিণীর আর্তনাদ ঝড়ের মতো তোলপার করে দেয় তার সমস্ত শরীর-

"...গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ে আবার নবীন।"[৯]

গল্পের শুরুতে যেমন দেখতে পাওয়া যায় লাঞ্ছিত মানুষদের আগুন জ্বালিয়ে চরম বিদ্রোহ, তেমনি আবার গল্পের শেষে এসে তাদের চূড়ান্ত হেরে যাওয়ার বর্ণনাও পাওয়া যায়। ক্ষমতা যখন বিদ্রোহী প্রাণগুলোকে কেড়ে নিতে পারে না তখন তারা অতি নিম্নে নেমে শিকার করে তাদের ঘরের স্ত্রীদের। কারণ তারা জানে এমন কঠিন জবাব দিতে জানা মানুষগুলোকে তারা বশ করতে পারবে মনের আঘাত দিয়ে। লেখক যেমন একদিকে অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার লড়াইকে তুলে ধরেছেন তেমনি অত্যাচারকারীর নিম্ন মানসিকতা ও মেয়েদের প্রতি নির্যাতনের চিত্রও তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

অত্যাচারের চিত্র অঙ্কনে লেখক ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে 'স্বাধীনতা দিবস' গল্পটি রচনা করেছেন। ১৯৪৪ সালে রচিত এই গল্পে ১৫ই আগস্ট নয়, স্বাধীনতার আশা নিয়ে পালিত ২৬শে জানুয়ারির স্বাধীনতা দিবসের প্রসঙ্গ এনেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইকারী বিপ্লবিদের অত্যাচাররের পাশাপাশি, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের উপর হওয়া অত্যাচারের কথা বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। কিসান, তাঁতী, কুমোর, কামারদের গ্রামের জমিদার অম্বিকাচরণবাবু। মাঠে নতুন ফসল উঠার সময়, কিন্তু মাঠ ধূ ধূ ফাঁকা। অম্বিকাচরণ বৈঠকখানা থেকে দেখতে থাকেন ঝড়ে ভাঙা ঘরগুলো। কিন্তু ভাঙা ঘরগুলোর থেকেও তার মন টানে পীর আফজল শেখের পাঁচ কাঠা জমিটা। আর ভাবতে থাকেন, এই জমিটাই এবার তার চায়। কিন্তু তার ভাবনায় বাঁধা পরে চৌকিদার সাহেব আসার ফলে। চৌকিদার খবর দেয় - "দারোগাবাবুর ডাক।"[১০]

দারোগাবাবুর নামেই অম্বিকাচরণের বুক কাঁপতে থাকে। দারোগাবাবু ব্যঙ্গ করে তাকে এস-ডি-ও সাহব বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ মাস ছয় আগেই দারোগাবাবুর অফিসের ঘরদোর সব ভেঙে ফেলেছিল গ্রামের লোকেরা। তবে দারোগাবাবু এবার এসেছেন হুশিয়ারি জানাতে। বেঁটে-খাটো একটা রিভলভার নিয়ে খেলা করতে করতে তিনি জানান অম্বিকাচরণকে জানান, আর দিন পাঁচেক পরেই ২৬ জানুয়ারির স্বাধীনতা দিবস। তিনি আরো সতর্কবার্তা দেন-

"মাত্তর গুটিদশেক বন্দুক তো এনেছি, দেখি পাখি শিকার কেমন হয় এবার।"[১১]

দারোগার বরফের মতো জমাট বাঁধা কণ্ঠের প্রশ্নে অম্বিকাচরণ শুষ্ক কণ্ঠে জানায় পতাকা তোলার লোকজন সবাই জেলে বন্দি। আর যারা গ্রামে আছে তারা চাষাভূষা, খাবারের অভাবে তারা সব মরনাপন্ন। দারোগাবাবুর কাছ থেকে ঘরে ফিরে দাওয়ায় জমা ভিড় দেখে তার মনে পরে আজ ধান দেওয়ার দিন, বুভুক্ষগুলোর জমির বদলে। দারোগার আগমনের কথাটুকু জানিয়ে তিনি ডুবে যাব হিসেবে। জমির হিসেব তিনি নিজে করেন আর টাকার অঙ্ক কষে তার ছেলে উপেন। টিপসই দিয়ে বিক্রি করে দেয় অম্বিকাচরণকে দুই বা দশ বিঘা। অম্বিকাচরণের ধানের গোলা ঘিরে সর্বভূকের ভিড় জমে থাকে। সব হিসেব চুকানোর পর তিনি দারোগার কথাটি পারেন। স্বাধীনতা দিবস, দারোগার দশটা বন্দুকের কথা শুনে তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। মাঠের পশ্চিমপ্রান্তের দিকে রিলিফ অফিসের পাশেই দারোগার তাঁবু পড়েছে। অম্বিকাচরণ তাদের বারবার সতর্ক করে চেয় দারোগাবাবু সম্পর্কে –

"দারোগা বলে দিয়েছে আমাকে। পতাকা-টতাকা তুললে এবারে স্রেফ গুলি।"[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উৎকণ্ঠিত দলের মধ্যের একজন শ্রীমন্ত, সবাই চলে যাবার পরও বসে থাকে দাওয়ার এক পাশে। শ্রীমন্ত টাকা চায় অম্বিকাচরণের কাছ থেকে রেজেস্ট্রির আগেই, কিন্তু অম্বিকাচরণ তা দেবে না। শ্রীমন্ত মায়ের অসুস্থতা জানিয়ে টাকা চায়। কিন্তু অম্বিকাচরণ রেগে মাত্র সাত কাঠা জমির বদলে যে পাঁচমণ ধান সে নিয়েছে তা ফেরৎ চেয়ে বসে। শ্রীমন্ত পায়ে পরে কাঁদতে থাকলে তিনি শ্রীমন্তর চার কাঠার মতো ভিটে জমির বদলে ওষুধের টাকা দিতে রাজি হন –

> "ভিটে...শেষকালে ভিটেটুকুও নেবেন বড় বাবু... চোখে জল, গলা কাঁপে শ্রীমন্তের।"[১৩]

শ্রীমন্তের কথাগুলো চাবুকের মতো দাগ কাটে অম্বিকাচরণের গায়ে। মাঠের পথে ফেরৎ আসার সময় শ্রীমন্তকে অন্যেরা জিজ্ঞাসা করে টাকা সম্বন্ধে, বড়বাবুর এমন নিষ্ঠুরতা শুনে তাদের সন্দেহ হয় তাদের বিক্রিত জমির টাকাগুলো সে আসলে দেবে কিনা। শ্রীমন্তরা দুই ভাই,ছোটো ভাই এখন নেই -

> "কিন্তু সে মুখ থুবড়ে মরেছে ছ-মাস আগে থানার সুমুখে।"[১৪]

শ্রীমন্তের নিজেকে পাগলের মতো মনে হয়। অন্যদিকে অম্বিকাচরণ দারোগার চাটুকারীতা করতে ব্যস্ত সারাদিন। দারোগা সশস্ত্র দল নিয়ে সফর করে গ্রামে গ্রামে। যেন ২৬শে জানুয়ারি নিয়ে কোথাও কোনো কিছুর আভাস না পান। দারোগাবাবুর সৈন্যদের কুচকাওয়াজের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় দূরে কেউ টেনে টেনে কাঁদছে। শ্রীমন্ত ভিটে জমি বেচতে আসে বড়বাবুর কাছে, টাকা গুনে সোজা চলে যায় ডাক্তারের কাছে। কিন্তু ফল কিছু হয় না, সময় প্রায় শেষ, শ্রীমন্তের মা মারা যায়। সে কাউকে কিছু না জানিয়ে সন্ধ্যাবেলায় দেহ চাটাই মুড়ে ফেলে আসে খালে। ঘরে ফিরে ভাইয়ের মুখ থুবরানো দেহ ও মায়ের খালের ধারে পরে থাকা শীর্ণদেহ মনে করে চোখের জল গড়িয়ে পরে, আর মনে হতে থাকে 'স্বাধীনতা দিবস'। মনে হতে থাকে শ্রীমন্তের সে যদি একবার একটা পাতাকা পেত তবে দেখিয়ে দিত শোষনকারীদের। কারণ যেমন অম্বিকাচরণ তেমনি দারোগা উভয়েই ভয় করে তিনরঙা পতাকাকে। শেষ রাত্রে প্রতিবেশী রাখালের ঘরে এসে শ্রীমন্ত জানায় সে চলে যাচ্ছে,কোথায় তার ঠিক নেই, ক্রমেই অন্ধকারে মিশে যায় শ্রীমন্ত। রাখাল দাঁড়িয়ে দেখে তাকে, রাগে গা কাঁপতে থাকে, আর মনে ভাবতে থাকে হয়ত তাকেও এভাবেই সব ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে হবে যেকোনো সময়। সে রাত্রি ভোর হওয়ার পর অধরের ভিটেতে বাঁশের আগায় খবরের কাগজের ওপর তিনরঙা জাতীয় পতাকা দেখতে পায় অম্বিকাচরণ। আর তার সঙ্গে দেখে কিসান পাড়া, কুমোড় পাড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো দেহের বুভুক্ষ মানুষগুলো। অন্যদিকে মাঠের দিক থেকে এগিয়ে আসছে দারোগার পলটন বাহিনী–

> "ছাব্বিশে জানুয়ারি-ছাব্বিশে জানুয়ারি কবে? হিসেব করেন অম্বিকাচরণ, আজই তো! পতাকাটার দিকে সভয়ে চেয়ে থাকেন তিনি।"[১৫]

গল্পে একদিকে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শত্রু সৈন্য বাহিনীকে দেখিয়েছেন, যারা নিযুক্তই হয়েছেন বিপ্লবীদের দমন করতে, অন্যদিকে জমিদার বা মহাজন সম্প্রদায়, যারা এই গ্রাম বাংলার মানুষ হয়েও নিজেদের প্রজাদের লুট করেছেন নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। প্রাকৃতিক কারণে যে মানুষগুলো খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের কাছে এমন নির্মম সময়েও মহাজন অম্বিকাচরণ কিছু ধান বা অর্থের বদলে জমি নিতে ছাড়েন নি। লেখক তাঁর লেখনীতে অত্যাচারী চরিত্রগুলোর মাধ্যমে, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের বাংলার দুঃসময়ের কথা তুলে ধরেছেন।

গ্রামের বুভুক্ষু জীবন, দিনের পর দিন আধপেট বা কখন না খেয়েই কাটাতে হয়েছে সাধারণ মানুষদের। ১৯৪৪-র বিশ্ব সংগ্রামের শিকার হয়ে গ্রামের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। তারই চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক 'অসুখ' গল্পে। বিশ্বযুদ্ধের আকালে গ্রামের মানুষ পারি দেয় শহরে কিছু খাবারের আশায়। গল্পের অন্ধ মহেন্দ্র, নারায়ণী, মালতী, সৌরভবুড়ী ইত্যাদি বুভুক্ষু প্রায় তিরিশ ছেলে মেয়ে বুড়ো মিলে থাকে মফঃস্বল শহরের উপকণ্ঠে সারকারি আশ্রয়ে। যাদের সব নিঃস্ব, কিছু খেতে পাওয়ার আশায় তারা এসে জোটে এই ত্রাণ শিবিরে। সেখানে ধান ভানা, দড়ি পাকানোর কাজ করে এবং দুটো খেয়ে বাঁচে। কিন্তু ক্রমেই খবর আসে যাদের আত্মীয় স্বজনের খবর পাওয়া গেছে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাদের গ্রামে। ভয় আঁতকে উঠে সরকারি আশ্রয়ের সকলে, আবার সেই ধূ-ধূ প্রান্তর চারিদিকে, আবার না খেতে পাওয়ার চিন্তা গ্রাস করে তাদের। তার সঙ্গে নিজের বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে তিরস্কার পেয়ে তারা আরো পালিয়ে এসেছে গ্রাম থেকে। অন্ধ বুড়ো মহেন্দ্রকে তার ছেলে একমুঠোও খেতে দেয় নি, মেয়ে জামাই তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে, এসে পরেছে সরকারি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আশ্রয়ে। সৌরভীবুড়ীর চোখে ছানি পরেছে কিন্তু সে ফিরে যেতে চায় না গ্রামে। সৌরভীবুড়ী ও মালতী একই গ্রামের মানুষ। মালতীর স্বামী আছে কিন্তু তাকে ছেড়ে মালতীপালিয়ে এসেছে শহরে। দিনের পর দিন না খেতে পাওয়া, সংসার টেনে টেনে চালানো, তারপর আবার বিনোদের চেলা কাঠের মার মালতীর গায়ে দাগ ফেলেছে। আগের এইসব কথাগুলো মনে পড়তেই মালতীর শরীর শিউরে ওঠে। সরকারি আশ্রয়ে সাহেবের কুদৃষ্টি, অন্যান্য আশ্রয়কারীদের সঙ্গে ঝগড়া হলেও খেতে পায় সে, নিজের মতো করে বেঁচে থাকে। কিন্তু বরখাস্তের নোটিশের পর তার আর থাকা চলে না সেখানে। শ্রীনাথ চৌকিদারের সঙ্গে খেয়া ঘাটের পথ ধরে মালতী ও সৌরভী। কিন্তু খেয়া ঘাট আসার আগেই মালতী পালিয়ে যায়, সে ফিরতে চায় না ঘরে। সৌরভী ছানি পরা চোখে দেখতে পায় না সে কোথায়। তাই সে ফিরে আসে আবার গঞ্জের বাজারে আর গালি দিতে থাকে মালতীকে। দিন কয়েক পর আবার দেখা হয় তাদের বাজারে, কিন্তু দুইজনের কেউই খেয়া ঘাটের পথে যায় না আর। কিন্তু হঠাৎ একদন বাজারে মালতীকে ধরে ফেলে বিনোদ, সে এসেছিল কুইনাইন কিনতে। বিনোদের বোন-জামাই মারা যাবার পর তাদের ছেলে কালীকে নিজের ঘরে এনেছে বিনোদ, তার জ্বরের জন্য এই কুইনাইন। ধরে নিয়ে যায় মালতীকে, যে মালতী সরকারি আশ্রয়ে মুখরা ছিল আজ সে বোবা। ঘরে এসে সেই খসে পড়া চাল, ধসে আসা মাটির দেওয়াল, দাওয়ার এক পাশে নির্মিত কালিতে কালো দেওয়ালের রান্নাঘর, তার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে থাকা কালীকে দেখে তার কান্না আসে। মালতী কি করবে ভেবে পায় না, নিথর হয়ে বসে থাকে মাটিতে। গ্রামের প্রতিবেশীরা এসে মালতীকে দেখে নোংরা শাড়ি পরা, গায়ে পুরু ময়লা, আঁসটে গন্ধ সর্বাঙ্গে। স্বামীর প্রহারে কপালে কাটা দাগ নিয়ে হরিমতি শোনায়-

> "সাত জায়গায় ঘোরা ও মেয়ে, এবার টের পাবে বিনোদ।"[১৬]

মালতীর চরিত্রের যেন এক মিমাংসা করছে তারা। কিন্তু মালতী যখন মার খেয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বিনোদ তখন তাদের মনে আসে নি কোনো কথা। বিনোদ বাজার থেকে কিনে আনে একখানা শাড়ি, আর কালীর জন্য কিছু সাবু, বলে-

> "এই কটি সাবু-এক টাকা। সাতদিন যেন হয়।"[১৭]

মালতীর ভালো লাগে না অভাবের অভিযোগ, একজন পুরুষের অধিনে ধুকে ধুকে দিন যাপন তার অসহ্য লাগে। বিনোদ পুরোনো খড়ের বদলে নতুন খড় ছাইবার জন্য আনে। আর মালতীকে কলসি ভরে ভরে জল নিয়ে আসতে হয় খড় নরম করার জন্য। খড় দিতে দিতে মালতীর চোখ যায় দূর মাঠের দিকে-গঞ্জের বাজার, চালা ঘর শহরের পাশে, বাধাহীন দিন যাপন। তার ভয় করে বিনোদকে দেখে আবার হয়ত মারবে আবার হয়ত তাড়িয়ে দেবে।

মালতীকে আবার দেখা যায় গঞ্জের বাজারে। আড়তদার হাসি, খেয়াঘাটের মাঝি মোল্লাদের ইঙ্গিত কোনো কিছুকে তার ভয় লাগে না তার বিনোদের মতো। সরকারি রিলিফের ডাক্তারখানায় বেয়ারার কাছে বসে থাকে মালতী। ডাক্তার এসে মালতীকে দেখে বেয়ারার উপর চিৎকার করে উঠে – "...ফের যদি ওই সব মেয়ে মানুষ ঢোকাস এই ঘরে- দূর করে দেব। শূয়ার-"[১৮] –ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে আবার সামনে বিনোদ। হাত টেনে ঘরে নিয়ে যেতে চায়, মালতী মাটিতে বসে পড়ে –

> "খেতে দেবে না-পরতে দেবে না, ... যাবে না সে মরতে, ভিখিরির মতো খেয়ে বাঁচতে।"[১৯]

– বোকার মতো বিনোদকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায় মালতী। বিনোদ ডাক্তারের কাছে এই রোগের ওষধ চাইলে ডাক্তার জানায় তার কাছে এমন রোগের ওষধ নেই।

গল্পে দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি মানসিক যন্ত্রনার চিত্রও তুলে ধরেছেন। না খেতের পাওয়া কঠিন সময়ে কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে না, নিজেকে বাঁচানোর তাড়নায় সকলে ব্যস্ত দুটো ভাতের সন্ধানে। শহরের কঠিন নির্যাতনের মধ্যেও মালতীর মতো মেয়েরা বেঁচে থাকতে চায় খাবারের জন্য, নিজের মতো করে বেঁচে থাকার জন্য। লেখক গল্পে দেখিয়েছেন শোষন কেবল বাইরের ক্ষমতাশালী মানুষের দ্বারাই নয়, ঘরের আপনজনের দ্বারাও হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে।

ভগীরথ মিশ্র : ভগীরথ মিশ্র বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম এক নাম, যাঁর লেখার প্রতি ভাঁজে পাঠক বর্তমান সমাজের প্রতিরূপ দেখতে পায়। ভারতের স্বাধীনতার কিছু মাস পূর্বেই তাঁর জন্ম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁতরাপুর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রামে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে। গ্রামে জন্ম এবং জীবন যাপনের কারণে তাঁর লেখা গড়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে। ভগীরথ মিশ্রের লেখনীতে আর্থ-সামাজিক ফাঁদে পরা মানুষগুলোর জীবনের হাহাকার ধ্বনি শোনা যায় অবিরত। স্বাধীনতার পরেও প্রান্তিয় মানুষের জীবন ছিল বিপর্যস্ত। উচ্চ শ্রেণির মানুষ তথা শোষক সমাজ এবং নিয়তির দ্বারা লাঞ্ছিত মানুষের চরম বিপর্যস্ততা ও অসহায় পরিস্থিতির পরিচয় মেলে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। অর্থের কারণে বিপাকে পরা এবং তার ফল স্বরূপ তাদের সর্বস্ব নিঃস্ব হওয়া, কোনো ক্রমে বেঁচে থাকার লড়াই লেখকের কলমের আঁচড়ে পাঠক মনে দাগ কাটে। তাদের যৎসামান্য স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে যাওয়া ও তার পীড়া লেখকের লেখনীতে ধরা দিয়েছে বিভিন্ন ভাবে।

লেখক ভগীরথ মিশ্রের রচিত ১৯৬৬ সালে, তাঁর দ্বিতীয় গল্প 'তারা নয় জোনাকি'। এই গল্পে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের সাঁওতাল মেয়ের আদলে সমগ্র সাঁওতাল তথা গ্রামের দীনহীন মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন। বিহারের ছোট একটি গ্রাম খানুডি-র সাঁওতাল মেয়ে টুংরি। পড়ন্ত বিকেলে কথক মিলের কাছে এসেছেন, সেখানেই দেখা টুংরির সঙ্গে। কথক পরিবারসহ যেবার খানুডিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন, টুংরিই তখন তাদের কাজ কর্মের দায়িত্বে ছিল। টুংরির বিয়ে হয় তারই প্রতিবেশী সাঁওতাল ছেলে বাঁকার সঙ্গে, একটি ছেলেও হয়। কিন্তু বাঁকা টুংরিকে ছেড়ে সর্দারের মেয়ে মংলির রূপে আসক্ত হয়ে পরে। টুংরি ছেলেকে নিয়ে চলে আসে মিলে কাজ করতে। কিন্তু টুংরি কখনই মিলে কাজ করা পছন্দ করত না। টুংরির কথায়-

"হোথায় মানুষের ইজ্জত থাকে নাই গো। সেথা যাবো কেনে?"[২০]

টুংরি রঙিন স্বপ্ন বেঁধেছিল বাঁকা ও তার নিজস্ব সংসার নিয়ে। নদীর ধারে তারা বাসা বাঁধবে, বাঁকা শিকারে পটু, তাই বাঁকা যখন শিকার করতে যাবে, টুংরি তখন ঘরের পাশে লাগানো ফসলের দেখা শোনা করবে। আর বাঁকা ফিরে এলে তার বাঁশি শুনে পরাণ জুরাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত টুংরির একটি স্বপ্নও পূরণ হয় নি। যে কদর্য মিলকে সে ঘৃণা করত, সেখানেই দিনযাপনের তাড়ণায় ছুটে এসেছে। কথক যখন খানুড়িতে ঘুরতে যান তখন টুংরির বয়স প্রায় বারো-তেরো, তখন সে লাল ফুলকাটা শাড়ি পরে খোঁপায় ফুল গুঁজে ঘুরে বেরাত। ফুল টুংরির খুব প্রিয়। কিন্তু যেমন গাছ থেকে ফুল ভেঙে নিলে খুব শীঘ্রই শুকিয়ে যায়, টুংরির জীবনেও তাই ঘটেছে। টুংরির কোলের শিশুটি অসুখ হয় অনেকদিন, টাকা অভাবে টুংরি তার ছেলেকে হারিয়েছে। টুংরির সব রঙিন স্বপ্ন নিঃস্ব হয়ে গেছে। এই কাহিনী শুধু যেন টুংরির নয়, মিলে কর্মরত প্রত্যেক মেয়ের গল্প -

"মেয়েদের প্রায় প্রত্যেকের কোলে একটি করে বাচ্চা।"[২১]

অর্থাৎ শুধু টুংরি নয়, তার মতো হাজার হাজার মেয়ে এমন কঠিন সমাজের শিকার। বাঁকার মধুর বাঁশির শব্দের পরিবর্তে টুংরির কানে বাজে মিলের বাঁশি। ফুলকাটা লাল শাড়ির বদলে যৌবনের ছাপ ফুটিয়ে তোলা ময়লা শাড়ি পরনে। জোনাকির অদৃষ্টে যেমন তার আলোর জন্য তার মৃত্যু লেখা থাকে, এই মানুষগুলোর অদৃষ্টও যেন তেমনি। তারার মতো উজ্জ্বল মানুষগুলো সমাজের কদর্যতায় জোনাকির মতো নিভে যায়। লেখক সাধারণ লেখনির মাধ্যমে সমাজের বিকৃত দিকটি ও সাঁওতাল জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন 'তারা নয় জোনাকি' গল্পে।

'তারা নয় জোনাকি'-র টুংরির মতোই 'খাঁচার পাখিরা' গল্পে সাঁওতাল পঞ্চুকেও সমাজের অর্থশক্তির দ্বারা অত্যাচারিত হতে হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র পঞ্চু অন্যের জমিতে ফসলের সময় কাজ করে। আর যখন কাজ কিছু পায় না, তখন সে বনে শিকার করে, পাখি শিকার। পঞ্চুর ঘরে তিনটি মানুষ, পঞ্চু নিজে, তার বউ ও ছেলে চৈতন। তবে এই তিনটি মানুষের পেট চালানোর দায়িত্ব তাদের পোষ্য একটি ঢ্যামনার। ওই ঢ্যামনার সাহায্যেই মাদি ডাহুকগুলোর শিকার করে পঞ্চু। ঢ্যামনা পাখিটার আকুলী ডাকে বনের মাদি ডাহুকগুলো ছুটে এসে ধরা দেয় জালে এবং পঞ্চু সেগুলো ধরে বিক্রি করে। পঞ্চুর বউ এই কাজ কর্মের বিরুদ্ধে, তার কথায় –

"পাইখটা সনসার চালায় ক্যানে? সনসারের মরদটা কী করে?"[২২]

পঞ্চু চৈতনকেও এই ধরার প্রশিক্ষণ দেয়, বনে কোথায়, কখন গেলে বেশী ডাহুক ধরা যাবে সেই নিয়ে। কিন্তু পঞ্চুর বউ বলে-

"লরকে যাবে তুমি।"[২৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পঞ্চু পাখিগুলো বিক্রি করতে গেলে, পঞ্চুর বউ পুকুর ঘাটে আসে। সেখানে দেখা হয় কুসুম, গল্পে উচ্চারিত কোসম মাসি-র সঙ্গে। কোসম গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি দুয়ারি ঘোষ ওরফে মেজোবাবুর বাড়ির কাজের লোক। পঞ্চু যেমন মাদি ডাহুক ধরার জন্য ঢ্যামনা পাখির টোপ ফেলে, মেজোবাবুও গ্রামের নারী ধরার জন্য কোসমকে দিয়ে টোপ ফেলায়। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের অর্থ অবস্থা খারাপ, বিশেষত পঞ্চুর ভীষণ খারাপ, তাই কোসম মাসি পাঁচ টাকার টান টান নোট এগিয়ে দেয় পঞ্চুর বউ-র দিকে। নোটের উপর আঁকা পশুর জ্বলজ্বলে দুটো দেখে পঞ্চুর বউ ভয় পায়। রাত্রে স্বপ্নে দেখে সে সেই পশুর মুখ গহ্বরে ধরা পরেছে। ভেতরে একখানা কাঁচা সোনার ঘরে সে আঁটকা; সামনে বসে আছে মেজোবাবু, সে বলছে –

"এই দেখ, পঞ্চার বউ, এসবই তোর। আর তুই শুধু মোর।"[২৪]

এই ঘটনার পর পঞ্চু মেজোবাবুর কাছে এই নিয়ে কথা বলতে গেলে মেজোবাবু পঞ্চুকেই অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। পঞ্চু বনে পাখি ধরতে গেলে তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার পোষ্য ঢ্যামনার ডাক তাকে পাগল করে দেয়। ঢ্যামনার চোখগুলো তার মেজোবাবুর চোখ বলে মনে হয়। খাঁচার ভেতরে পাখিটা ডেকেই চলেছে মাদি ডাহুকে আকৃষ্ট করার জন্য। পঞ্চু আর থাকতে পারে না, খাঁচার ভেতর থেকে বের করে ঢ্যামনাটার গলা মোচড়াতে থাকে, কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পরে। ব্যথায় কেঁদে ওঠে পঞ্চু, দেখে পাখির গলা নয়, কয়েকটি বঁইচির ডাল চেপে ধরে আছে হাতের চেটোয়, তার কাঁটা ফুটে রক্ত ঝরছে। তাকিয়ে দেখে চার-পাঁচটা মাদি ঢ্যামনার দিকে গলা ফুলিয়ে এগিয়ে আসছে, ফাঁদের দিকে নজর নেই তাদের আর। ঢ্যামনার চোখগুলোও যেন খরিশ সাপের মতো ঠান্ডা, শিকার কাছে। পঞ্চু ঢ্যামনাকে চুপ করাতে চায়, শিকার থেকে বাঁচাতে চায় ডাহোকগুলোকে, কিন্তু পারে না। বেরোনোর আগে ছেলে বলেছে কাল রাতে পেটের একটা কোণাও ভরে নি। ধীরে ধীরে জাল থেকে মাদিগুলোকে ছাড়িয়ে সরু লতানো ডাল দিয়ে বেঁধে ফেলল পঞ্চু, বিক্রি করার উদ্দেশ্যে।

গল্পে ঢ্যামনা, মাদি ডাহুক, ফাঁদ, টোপ দেওয়া সবই সমাজের কদর্য দিককে তুলে ধরে। অর্থের শক্তিতে সব মানুষকে বশ করা যায়। পঞ্চু ঢ্যামনা তথা মেজোবাবুকে শেষ করতে চাইলেও পারে না। অর্থাভাব, খাদ্যাভাব মানুষকে দিয়ে সব করায়, যা সে চায় না। গল্পের শেষে পঞ্চু পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে, সে চাইলেও তার কিছু করার ক্ষমতা নেই। নিজের এবং পরিবারের জীবন রক্ষার্থে সমাজের এই প্রতারণা তাকে সহ্য করেই এগিয়ে চলতে হবে। সমাজে সাপের লালসা, ফাঁদ ফেলা এবং তাতে শিকার-এইরূপ ক্রমাগত ভাবে চলতে থাকবে, এবং সাধারন মানুষ তার শিকার হবে ঠিক মাদি ডাহুক ও পঞ্চুর মতো।

কেবল সমাজের প্রতারণা নয়, উপোসী মানুষদের সমাজ ও প্রকৃতি উভয়ের কাছে থেকেই বাঁচার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। দিন খেটে দিন খাওয়া মানুষগুলো প্রকৃতির প্রকোপে পরে না খেতে পেয়ে হাত পেতে বসে অর্থসম্বলিতদের পায়ের কাছে। সেই অর্থের চক্রে গভীর এক মজুরের গর্তে বন্দি থাকে সেই মানুষগুলো দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। যেন হাঁ করে বসে আছে সুযোগ নেওয়ার অপেক্ষায়, সেখানে প্রবেশ করলেই মুখ বন্ধ, আর বেরোনোর উপায় নেই, এমনি ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর 'কার্তিকের কড়চা' গল্পে। গল্পের প্রধান চরিত্র করাতও এই চক্রের শিকার। শ্রাবণের ধারায় যখন আশ্বিন-কার্তিক ভরাডুবি তখন চলে প্রকৃতির চাবুক তাদের উপর। শস্য, ফসল যখন কিছুই থাকে না, শরীর নিজেই নিজেকে খেতে বসে। সংসারে কেউ কাউকে চিনতে পারে না, সকলেই এক একটি কাকতাড়ুয়ায় পরিণত হয়, তখন অর্থ ভর্তি মুখগুলো হাঁ করে বসে থাকে। পাঁচ কেজি ধানের বদলে, আঘ্রাণ-পৌষ মজুর খাটা। দুই মাস খেতে দিলে, পরের দুই মাসের না খেতে পাওয়ার বন্দোবস্তো আগে থেকেই করেন বাবুরা। কাঁপতে থাকা শরীরে করাতের মতো অন্য মানুষগুলোও পাঁচ কেজি ধান মাথায় নিয়ে ছুটে যায় ঘরে। প্রতি বছর একই ভাবে চলে, বর্ষার মাঠে কাজ নেই, সরকারের কোনো প্রকল্প কাজ চলে না, আর এই সুযোগেই বসে থাকে বাবুরা। কোনোরকমে একটু খেতে দিয়ে তাদের মজুর আদায়। অঘ্রান-পৌষ এলেই শুধু শোনা যায় মাঠে ধান কাটার শব্দ, ভাত রান্নার গন্ধ আর নেই। দাদন শোধের পীড়াপীড়িতে খেতে না পাওয়া মানুষগুলোর যেন প্রাণ যেতে বসে। করাতেরও বাবুদের কাছে দাদনের দায় গলা ডুবে। ভোর হতে না হতেই বাড়িতে তাদের হামলা চলে, কোন বাবু ধরে নিয়ে গিয়ে তার দাদন আদায় করবে তার লড়াই চলে। যে যেদিন করাতকে নিয়ে যায়, সেদিন তার জমিতে সারাদিন ধার কাটা চলে, পরিবর্তে করাত ও পরিবারের মেলে উপোসী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দিন। উপোস থেকে বাঁচতে করাত, বউকে নিয়ে পালায় ভোরে দূর গ্রামে লগদা খাটতে। বদলে মিলবে কিছু মুড়ি, যা বাড়ি নিয়ে যেতে হবে সন্তানের জন্য। আর মিলবে বিউলি ডাল, ভাত, সেই খাবে অতিরিক্ত ভরপেট পরদিনের মতো পেট ভরিয়ে। কিন্তু প্রতিদিন ভোরে বউকে নিয়ে পালাতে পারে না, যেদিন ধরা পরে যায় সেদিন উপোস। শুধু উপোস নয় মাঠে কাজের সময় বাবুদের শকুন দৃষ্টির মোকাবিলা করতে হয় করাতের বউকে। সেদিনও সকালে পালাচ্ছিল বউকে সঙ্গে করে ঝোঁপ, ঝাড় পেরিয়ে কিন্তু পথে বাঁধা পরে শম্ভু মালিকের, তাকে দেখে লুকিয়ে যায় দুইজন। এদিকে মল্লিক বাবু নড়ে না, অন্যদিকে বেলা বেড়ে চলে। লগদা খাটার নিয়ম সূর্য চড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করার, সূর্য যাওয়ার পর শেষ। সময়ের সামান্য হের ফের চলে না। করাত ভয় পায়, আজ যদি কাজ না পায় তবে আগামী দুইদিন উপোস থাকতে হবে। মল্লিকের নজর এড়িয়ে কোণো ক্রমে ঝোপঝাড় পেরিয়ে, পাকা ধানের আল ধরে ছুটতে থাকে। কিন্তু কাজে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়ে যায়, কাজ মেলে না। স্বামী-স্ত্রীর হাজারো কাকুতি মিনতির পরেও কোনো লাভ হয় না। পাকা ধানের গন্ধে ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে টলতে টলতে ফিরে আসছে গ্রামের ঘরে। সামান্য খাবারের আশাটুকু অনাদিভঞ্জ বাবু পায়ের তলায় গুড়িয়ে দেয়। মাথায় একরাশ চাপ নিয়ে ফেরে করাত –

"দন্ডে-দন্ডে পলে-পলে আরও একটা দীর্ঘ খাদ্যহীন দিন।"[২৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক সময় থেকেই বাংলা ছোটগল্পের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। পূর্বের ছোটগল্পের অপূর্ণ বাস্তব চিত্রগুলোকে লেখকেরা নতুন আঙ্গিকে সমাজের কঠিন বাস্তবতাসহ বিনা পর্দায় তুলে ধরে ছিলেন। সভ্য নীতি বোধের বাইরে সমাজকে তার কদর্য দারিদ্রতা, জীবনকে বাঁচানোর জন্য মানুষের কঠোর বাস্তবের সঙ্গে লড়াইয়ে তার ভেঙে পড়া, তার হীনতা ছোটগল্পকারদের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। শুধু বিদেশি শক্তির অত্যাচারে নয়, স্বাধীন দেশেও পিছিয়ে পরা মানুষদের জীবন একই নির্দয়তার সঙ্গে যাপন করতে হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে যেমন উদ্বাস্তু স্রোত, দাঙ্গা, মন্বন্তর বাঙালির জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তেমনি স্বাধীনতার পরেও বাঙালির জীবনে এই হাহাকার চলতে থাকে। কাগজে দেশ স্বাধীন হলেও, স্বাধীনতার স্বাদ খেটে খাওয়া মানুষদের ঘরে এসে পৌঁছায় নি, সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করার চেষ্ঠা করব-

- লেখক সুশীল জানার 'রাত্রির লেখা' গল্পে যেমন একদিকে দেখানো হয়েছে বিদ্রোহের আগুন, তেমন তিনি দেখিয়েছেন সেই আগুনের হল্কা বিদ্রোহীর পরিবারের উপরেও এসে পরেছে। শোষক যখন বিদ্রোহের অঙ্গার মেরে কেটে নেভাতে পারে না তখন হাত দেয় ঘরের মেয়েদের সম্মানে। একই ভাবে দৈনতার সুযোগে ঘরের স্ত্রীর উপর শোষকের তীব্র লালসার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'খাঁচার পাখিরা' গল্পে। প্রথম গল্পটি রচিত স্বাধীনতার প্রাককালে ১৯৪৪ সালে, এবং দ্বিতীয় গল্পটি রচিত স্বাধীনতার তেত্তিরিশ বছর পর ১৯৮০ সালে। কিন্তু দীর্ঘ তেত্তিরিশ বছর পরেও শোষকের লালসা, দীনকে শোষনের চিত্র একই দেখা যায়।
- সুশীল জানা ১৯৪৪ সালে দেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে তাঁর গল্প 'স্বাধীনতা দিবস' রচনা করেন। যেখানে না খেতে পাওয়া মানুষগুলো জমিদারের কাছে তাদের সর্বস্ব হারিয়ে দেয় শুধু একবেলা পেট ভরানোর জন্য। তাদের ফসলের জমি, তাদের মাথার ছাদও কেড়ে নেয় শোষক কিন্তু একমুঠো ভাত পায় না তারা, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পরে তারা। এমনি একবেলার ভাতের জন্য মানুষের আপ্রাণ চেষ্ঠার কাহিনী লেখক ভগীরথ মিশ্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'কার্তিকের কড়চা' গল্পে (১৯৮০ সাল)। দুইমাস খেতে দিয়ে তাদের থেকে দাদনের কড়া মূল্য তোলে শোষক বাবুরা। ঘরের সন্তানদের মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দিতে না পারা বাবা মায়ের বেদনার কথা এই গল্পে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার প্রাককাল বা স্বাধীনতার উওরকাল, উভয় ক্ষেত্রেই খেটে খাওয়া মানুষের জীবন একই ভাবে চিত্রিত হয়েছে।
- সুশীল জানার গল্প 'অসুখ' ১৯৪৪ সাল এবং ভগীরথ মিশ্রের গল্প 'তারা নয় জোনাকি' ১৯৬৬ সাল, দুটি গল্পেই ঘরের মানুষের অত্যাচারে বা বিশ্বাসঘাতকতায় ঘর ছাড়া হতে হয়েছে দুই মা-কে। একদিকে মালতী পেট ভরে খাবার আশায় পালিয়ে এসেছে শহরে, অন্যদিকে সাঁওতাল মেয়ে টুংরিও অন্নের আশায় কদর্য কারখানায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইজ্জতের পরোয়া না করে কাজ করতে এসেছে। কেবল বাইরের শক্তি নয় ঘরের ভেতরের অত্যাচারও মানুষকে কিভাবে ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, তারই পরিচয় মেলে এই দুই গল্পে।

কালের বিবর্তনে সভ্যতা এগিয়ে গেলেও, পিছিয়ে থাকা মানুষগুলো একই ভাবে পিছিয়েই রয়েছে, তারই চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পকারেরা। দুই লেখকের গল্প রচনা কালের মধ্যে প্রায় তিরিশ বছরের অন্তরাল থাকলেও তাঁদের লেখনীর প্রসঙ্গ অত্যাচারিত, শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষদের জীবন যাপন, যা প্রমাণ করে আমাদের সমাজের সত্য, নগ্ন বাস্তবতাকে।

Reference:

১. জানা সুশীল গল্পসমগ্র, সম্পাদনা সুমিতা চক্রবর্তী, একুশশতক, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৯, পৃ. ৬১
২. তদেব, পৃ. ৬১
৩. তদেব, পৃ. ৬২
৪. তদেব, পৃ. ৬২
৫. তদেব, পৃ. ৬৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৪
৭. তদেব, পৃ. ৬৫
৮. তদেব, পৃ. ৬৫
৯. তদেব, পৃ. ৬৫
১০. তদেব, পৃ. ৮৯
১১. তদেব, পৃ. ৮৯
১২. তদেব, পৃ. ৯০
১৩. তদেব, পৃ. ৯১
১৪. তদেব, পৃ. ৯১
১৫. তদেব, পৃ. ৯২
১৬. তদেব, পৃ. ৮৭
১৭. তদেব, পৃ. ৮৭
১৮. তদেব, পৃ. ৮৮
১৯. তদেব, পৃ. ৮৮
২০. মিশ্র ভগীরথ ‘গল্প সমগ্র ১’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৩, মাঘ ১৪২৯, পৃ. ২১
২১. তদেব, পৃ. ১৯
২২. তদেব, পৃ. ৫৭
২৩. তদেব, পৃ. ৫৮
২৪. তদেব, পৃ. ৫৯
২৫. তদেব, পৃ. ১১৫